রামকৃষ্ণ সঙ্ঘে স্বামী গম্ভীরানন্দজীর অবদান

স্বামী ঋতানন্দ

পথাঙ্কনের সূচনা

ভারতবর্ষে বহুযুগ ধরে ধর্ম, দর্শন ও আধ্যাত্মিকতা বিভিন্ন ভাব ও মতবাদে সম্প্রদায়ভিত্তিক গোষ্ঠীসমূহের ভিতরে অনেকটা লোকচক্ষুর অগোচরে সাধকের ব্যক্তিগত সাধনা ও সিদ্ধির মধ্য দিয়ে বিকশিত ও সংরক্ষিত হয়েছিল। সেমেটীয় ধর্ম, বিশেষত ইসলাম ও খ্রিস্টধর্মের মধ্যে ভারতবর্ষ দেখল মিশনারি উদ্যম এবং তাদের ধর্মের প্রচার ও প্রসারে নিরলস উদ্যোগ। শ্রীরামকৃষ্ণ-ভাবাদর্শে এ-দুটি ভাব সমন্বিত হল তাঁর জীবনের অদৃষ্টপূর্ব সাধনা, অপরিমিত সিদ্ধি এবং লোকমানসে অভিনব এক নতুন যুগের বার্তা পৌঁছে দেওয়ার অসীম আকুতিতে। দুটি ধারা যুগ্ম হল স্বামী বিবেকানন্দের 'আত্মনো মোক্ষার্থং জগদ্ধিতায় চ' লক্ষ্যটি নির্দিষ্টকরণে।

সব সাধনার ইতি হলে শ্রীরামকৃষ্ণের সিদ্ধিরূপ ফল জগৎকল্যাণে নিয়োজিত হবে বলে জগন্মাতা তাঁকে কয়েকটি অনুভূতি করিয়েছিলেন। তার অন্যতম হল, তাঁকে জগন্মাতার যন্ত্র হিসাবে একটি অসাম্প্রদায়িক ধর্মসম্প্রদায়ের প্রবর্তন করতে হবে।[১] সেই উদ্দেশ্যসাধনেই জগদম্বার শ্রীরামকৃষ্ণকে ভাবমুখে থাকার নির্দেশপ্রদান। তারই পরিণামে তাঁর কাছে জগন্মাতা-চিহ্নিত বহু মানুষ সমবেত হতে থাকেন। তাঁরাই তাঁর অন্তরঙ্গ ত্যাগী ও গৃহী ভক্তের দল। শ্রীরামকৃষ্ণ-ভাবে তাঁদের জীবন গঠন এবং এই ভাবাদর্শের বেদিমূলে নিজেদের নিঃশেষে সঁপে দেওয়ার মধ্য দিয়ে উপরোক্ত যুগ্ম আদর্শটি জগতে রূপগ্রহণ করতে শুরু করে।

শ্রীরামকৃষ্ণ-পার্ষদদের পরবর্তী প্রজন্মের সন্ন্যাসিকুলের মধ্যে স্বামী গম্ভীরানন্দজীর জীবন ও কর্ম শ্রীরামকৃষ্ণ-ভাবাদর্শের নিরিখে এক উজ্জ্বল আলোকবর্তিকা। সে-বিষয়ে সংক্ষিপ্ত অনুধ্যান ও মননের প্রয়াস বর্তমান প্রবন্ধের উপজীব্য।

পথপরিক্রমার রূপরেখা

আত্মজিজ্ঞাসু তথা ব্রহ্মজিজ্ঞাসুর যে-প্রাথমিক গুণাবলি শাস্ত্রে নির্দেশিত হয়েছে, সেগুলি পূজ্যপাদ মহারাজজীর মধ্যে সুস্পষ্টরূপে ফুটে ওঠার পর তিনি বেলুড় মঠে আসেন সঙ্ঘে যোগদান এবং গুরুকরণের আকাঙ্ক্ষায়। বিবেক-বৈরাগ্যে ঋদ্ধ হয়ে সুদূর রেঙ্গুন (ইয়াঙ্গন) থেকে সামরিক বিভাগের চাকরিতে ইস্তফা দিয়ে তাঁর আসা। সামরিক শৃঙ্খলা, নিয়মনিষ্ঠা, আনুগত্য ও দেশপ্রেমে ইতোমধ্যে রপ্ত

তাঁর জীবন ও চরিত্রটি উত্তরোত্তর সুগঠিত হয়ে ওঠে। ধীর-স্থির, প্রশান্ত-গম্ভীর, মিতবাক, চালচলনে মার্জিত ও পরিমিতিবোধ তাঁর অন্তর্মুখিনতাকে প্রতিটি পদে প্রকাশ করত। ব্রহ্মচারী-জীবন থেকে আত্মনিষ্ঠ হয়ে সঙ্ঘের কাজে নিজের শক্তি ও সময়কে সুব্যবহার করেছেন। প্রবর্তক জিজ্ঞাসু থেকে শুরু করে বহু পথ পরিক্রমা করে অনেক বিশিষ্ট পদে আসীন থেকেছেন। ক্রমশ দায়িত্ব ও কর্তব্যের বোঝা অনায়াসে বহন করে সর্বশেষে 'গুরু'পদে বৃত হয়ে শ্রীরামকৃষ্ণের যন্ত্ররূপে অগণিত মানুষের আধ্যাত্মিক ক্ষুধা মিটিয়েছেন এবং তাদের জীবনপথের দিশারি হয়েছেন।

১৯২৩ খ্রিস্টাব্দে মহাপুরুষ মহারাজের কাছে আগে ব্রহ্মচর্য দীক্ষা এবং তারপর মন্ত্রদীক্ষা লাভ হয় তাঁর। গুরুর কাছ থেকেই কাশীতে সন্ন্যাসদীক্ষা পান। এসব আনুষ্ঠানিক দীক্ষাদির মাধ্যমে শুধু নয়, সব পথ বেয়ে স্বামী শিবানন্দজীই চিরআশ্রয় হয়ে ওঠেন তাঁর জীবনে। দেওঘর বিদ্যাপীঠে দু-দফায় ছিলেন এগারো বছর—১৯২৩-২৯ এবং ১৯৩১-৩৫ খ্রিস্টাব্দ। প্রথমে কর্মী, পরে প্রধান শিক্ষক ও শেষে অধ্যক্ষরূপে। প্রায় আট বছর (১৯৩৬-৪১ এবং ১৯৪৫-৪৭ খ্রিস্টাব্দ) মঠ ও মিশনের ওয়ার্কিং কমিটির সদস্য ছিলেন। সেসময় ছিলেন বেলুড় মঠে। প্রথমবারে মঠের প্রধান কার্যালয়ে 'অফিস মাস্টার' রূপে এবং দ্বিতীয়বার শাখাকেন্দ্রসমূহের পরিদর্শক হিসাবে তিনি কার্য নির্বাহ করেন।

১৯৪২-৪৪ খ্রিস্টাব্দে তিনি 'প্রবুদ্ধ ভারত' পত্রিকার সম্পাদক ছিলেন। তাঁর সুচিন্তিত সম্পাদকীয়গুলি সকলের প্রশংসা অর্জন করে। এর অনেক পরে দশ বছর (১৯৫৩-৬৩) তিনি ছিলেন মায়াবতী অদ্বৈত আশ্রমের অধ্যক্ষ। তাঁর অধ্যক্ষতায় মায়াবতী আশ্রমের উন্নতি হয়েছিল বহুদিকে। সবজি বাগানের চাষ বেড়েছিল, দূর হয়েছিল বহুদিনের জলের সমস্যা। গোশালায় ভাল জাতের গরু এনে দুধের পরিমাণ বাড়িয়েছিলেন, শুরু হয়েছিল মধু চাষ। কলকাতা থেকে আনিয়েছিলেন ভাল ফুলগাছ। সেসময়ের উত্তরপ্রদেশের মুখ্যমন্ত্রী সি বি গুপ্তা এসেছিলেন মায়াবতী আশ্রমে। তাঁর সাহায্যে লোহাঘাট থেকে আশ্রম পর্যন্ত সাড়ে সাত কিলোমিটার মেটাল রোড তৈরি করিয়েছিলেন মহারাজ, নাম দিয়েছিলেন মায়াবতী রোড। সেই সময়েই সাধুনিবাসটি দোতলা হল। কলকাতার প্রকাশনা বিভাগটি ছিল ৪নং ওয়েলিংটন লেনে। স্থান সঙ্কুলান করাতে তিনি ৫নং ডিহি এন্টালি রোডে জমি ক্রয় করে ভিত্তিপ্রস্তর স্থাপনা করালেন ১৭ নভেম্বর, ১৯৫৮ খ্রিস্টাব্দে। ১৯৬১ খ্রিস্টাব্দের ৮ ডিসেম্বর সেই নতুন বাড়ির উদ্বোধন হয়। সংযোজিত হয় একটি সাধারণ গ্রন্থাগার ও পাঠকক্ষ।

বাড়ি তৈরি করার কাজ মহারাজজীর একটি প্রিয় বিষয় ছিল। দেওঘরে থাকতে তিনি অনেক ইঞ্জিনিয়ারিং বই পড়েছিলেন এবং বহু ঘরবাড়ি তৈরি করিয়েছিলেন।

১৯৪৭ খ্রিস্টাব্দের মার্চ মাসে মহারাজ রামকৃষ্ণ মঠের অছি এবং রামকৃষ্ণ মিশন পরিচালন সমিতির সদস্য নির্বাচিত হন। সেই বছরই এপ্রিল মাসে তিনি মঠ ও মিশনের সহকারী সম্পাদক নিযুক্ত হলেন। ১৯৫৩ খ্রিস্টাব্দ পর্যন্ত তিনি ওই পদে ছিলেন। পুনরায় সহকারী সম্পাদক হন মায়াবতীর অধ্যক্ষতা করার পর ১৯৬৩ সালের ৫ অক্টোবর। তার আগে ১৯৪৯ খ্রিস্টাব্দে তিনি 'অ্যাডভাইসরি ফিনান্স কমিটি'র সদস্য হয়েছিলেন। ১৯৬৬ সালে স্বামী বীরেশ্বরানন্দজী সঙ্ঘাধ্যক্ষ হওয়ায় সেই বছর ১৬ ফেব্রুয়ারি মহারাজজী সাধারণ সম্পাদকপদে বৃত হন। প্রায় তেরো বছর তিনি ওই গুরুদায়িত্ব পালন করেন। এই কালটিকে অনেকেই প্রশাসনিক দিক থেকে একটি আদর্শ সময় বলে অভিহিত করে থাকেন। তাঁর ছিল বিচক্ষণ প্রশাসনিক ক্ষমতা, প্রগাঢ় সাধুতা, প্রচণ্ড পাণ্ডিত্য, প্রখর ব্যক্তিত্ব, প্রবল

বাস্তববোধ, অপরিমেয় কার্যক্ষমতা, প্রতিটি কর্মে ঈশ্বরারাধনার সচেতনতা এবং সঙ্ঘের কল্যাণে নিঃশর্ত আত্মনিবেদন। অনেকেরই অভিমত এই যে, নিজের সমস্যা বলে তাঁর কিছু না থাকায় জীবনের প্রতিটি মুহূর্ত তিনি সঙ্ঘসেবায় নিয়োজিত থাকতে পেরেছেন।

মঠ ও মিশনের যে-কয়েকটি শাখা মহারাজ সাধারণ সম্পাদক থাকা অবস্থায় সংযোজিত হয়ে সঙ্ঘের বিস্তার ঘটেছে সেগুলি হল—অরুণাচলের আলো, নরোত্তমনগর, ইটানগর, অসমের গুয়াহাটি, অন্ধ্রের হায়দরাবাদ এবং ছত্তিশগড়ের রায়পুর। বেলুড় মঠে তিনি অসুস্থ ও বৃদ্ধ সাধুদের থাকার সুবন্দোবস্ত করে 'আরোগ্য ভবন' তৈরি করেন। সাধুসেবার তহবিলটি যাতে বাড়ানো যায় সেজন্যও নিজে ব্যক্তিগতভাবে চেষ্টা করেছেন। তখন নতুন ব্রহ্মচারীদের বেলুড় মঠে যোগদানের ব্যবস্থা ছিল না। নবাগত কেউ যোগদান করতে এলে দু-তিনদিন তাকে ভিজিটার্স রুমে রেখে কোনও কেন্দ্রে পাঠিয়ে দেওয়া হত। মূলকেন্দ্র বেলুড় মঠের আধ্যাত্মিক পরিবেশ, কর্মপরিধির ব্যাপকতা সম্বন্ধে ধারণা হওয়া, প্রবীণ সন্ন্যাসীদের সঙ্গ ইত্যাদি সাধুজীবনের পক্ষে অনুকূল মনে করে মহারাজ নবাগত ব্রহ্মচারীদের শিক্ষণকেন্দ্র (Pre-Probationers Trainees Corner বা PPTC) চালু করেন স্বামী আত্মস্থানন্দজীর সহায়তায়।

এরপর মহারাজ সহাধ্যক্ষের পদে আসীন হন ১৯৭৯ খ্রিস্টাব্দের ১ এপ্রিল থেকে। প্রায় ছয় বছর তিনি ওই পদে ছিলেন। সেই সময়ের বেশিরভাগ তিনি রাঁচি মোরাবাদি আশ্রমে থাকতেন। মাঝে মাঝে মঠে আসতেন। মঠে এলে তিনি কাশীপুর মঠ ও বারাসাত মঠে দীক্ষা দিতেন। বীরেশ্বরানন্দজী মহারাজের মহাসমাধির পর তিনি একাদশ সঙ্ঘগুরুরূপে বৃত হন ১৯৮৫ খ্রিস্টাব্দের ৯ এপ্রিল। তখনই বলেছিলেন, "বড় জোর চার বছর থাকব।" তাঁর অধ্যক্ষতাকালে কেন্দ্রের সংখ্যা বেড়েছে দশটি : আগরতলা, বারাসাত, মেদিনীপুর, আঁটপুর, মাদুরা, পালাই, লখনউ, শিকড়া, জয়পুর ও টরন্টো। এছাড়া তিনি বহু মন্দির, গ্রন্থাগার প্রভৃতির উদ্বোধন এবং ভিত্তিপ্রস্তর স্থাপন করেছেন। যেকোনও অবস্থায় সঙ্ঘের যেকোনও কাজে সক্রিয়ভাবে সাড়া দিতে তিনি সে-সময়েও ছিলেন সদা উৎসুক ও প্রস্তুত। রামকৃষ্ণ সঙ্ঘের ঘরানার আদর্শকে সামনে রেখে একটি অসামান্য সাধুজীবন ছিল সকলের সামনে। সঙ্ঘকে বহুদিকে বিপুল অবদানে সমৃদ্ধ করে মহারাজ মহাসমাধি লাভ করেন ২৭ ডিসেম্বর ১৯৮৮। বয়স হয়েছিল ঊননব্বই।

বহুকৌণিক ভূমিকা ও অবদান

এই মহান এবং বিশাল কর্মময় জীবনের প্রতিটি পদক্ষেপে দেখা যায় একটু একটু করে অপরিমিত পরিমাণ অবদান সঙ্ঘের পরিসরে সঞ্চিত হয়েছে। এমনকী সেসবের মূল্যায়ন এবং বিশ্লেষণকেও পরিমিত আকারে প্রকাশ করা ভিন্ন আমাদের গত্যন্তর নেই। বিভিন্ন দৃষ্টিকোণ থেকে মহারাজজীর অবদানকে স্মরণ এবং লিপিবদ্ধ করা যেতে পারে। প্রথম, শ্রীরামকৃষ্ণ-ভাবের মূলকথা ঈশ্বরলাভ। তাঁর শক্তিতে শক্তিমান হওয়া। শ্রীরামকৃষ্ণ-আদলে তৈরি গম্ভীরানন্দজীর জীবনটি আদ্যোপান্ত একটি আধ্যাত্মিক জীবন। আধ্যাত্মিকতার পরিমাপ অনুভূতি এবং অভিজ্ঞতায়। তাঁর জীবনীগ্রন্থ এবং স্মৃতিচারণে উল্লিখিত হয়েছে যে, অমরনাথ দর্শনের পর তিনি নিজমুখে বলেছেন, "আমি দেখলুম ঠাকুর সেখানে বসে আছেন!" অন্য সময় বলেছিলেন, "আজকাল আমি দেখি শ্রীরামকৃষ্ণকে হৃদয়-মাঝে—স্বর্গীয় দ্যুতিতে বসে আছেন। না চাইতে কখনো কখনো আমার অন্তরে আবির্ভূতা হন শ্রীমা।" একটি যুবককে একদিন দৃঢ়স্বরে বলেছিলেন, "আমি ঠাকুরকে দেখেছি। তুমিও ইচ্ছা করলে দেখতে

পাবে।" একান্তে এক সেবককে বলেছিলেন, "বেলুড় মঠে স্বামীজীর দেখা পাওয়া খুব সহজ রে। একটু কেঁদে-কেটে রাতভোর তাঁর মন্দিরে জপ-ধ্যান করলে তিনি দেখা দেন।" এরকমই ছিল তাঁর প্রত্যয়পূর্ণ আস্থা যা অপরকে তীব্রভাবে নাড়া দিত এবং উদ্দেশ্যলাভে প্রণোদিত করত। একটু সাহস পেয়ে সেইক্ষণেই সেবক পূজনীয় মহারাজকে নির্দ্বিধায় প্রশ্ন করে, "মহারাজ, মা আপনাকে দেখা দেন?" মহারাজজী একটু এদিক-ওদিক তাকিয়ে ঘরোয়া আলাপের ভঙ্গিতে বললেন, "সে কী রে, তা না হলে কী নিয়ে বেঁচে আছি? মা ঠাকরুন আমায় ছেড়ে যান না।" সেবককে স্তম্ভিত করে প্রণামের ঘরে ঢোকার চিলতে বারান্দায় বাঁদিকের কোণটি তর্জনী দিয়ে দেখিয়ে বললেন, "আমি যখন এখানে (প্রণামের ঘরে) বসে থাকি, মা ঠাকরুন তখন ওখানে বসে থাকেন। আর আমি যখন ঘরে যাই, মা-ও তখন আমার সঙ্গে সঙ্গে ঘরে গিয়ে বসেন। তা না হলে কিভাবে আছি?" মন্তব্য নিষ্প্রয়োজন। কদাচিৎ কেন এ-স্বীকারোক্তি? শুধু সকলের মনে আশার সঞ্চার করানো।

স্বামী শিবময়ানন্দজীর প্রশ্নের উত্তরে পূজনীয় মহারাজ একবার বলেছিলেন, "আমি চোখ বুজলেই আমার হৃদয়ে ইষ্ট জ্বল জ্বল করছেন দেখতে পাই।" একটু থেমেই আবার বললেন, "তা ইষ্টদর্শন হলেই সব হয়ে গেল? সর্বভূতে ব্রহ্মদর্শন ইত্যাদি আর কিছুই করতে হবে না?" শিবময়ানন্দজী আরও কিছু জানার চেষ্টা করতেই মহারাজজী বলে উঠলেন, "ওটা ওখানেই থাক না।" বলেই প্রশ্নোত্তর পর্বের ওপর যবনিকা টেনে দিয়েছিলেন।

দ্বিতীয়, সারস্বত সাধনায় মহারাজ শ্রীরামকৃষ্ণ-পার্ষদদের উত্তরসূরিদের মধ্যে অন্যতম প্রখ্যাত রচনাকার, গ্রন্থকার, অনুবাদক এবং ইতিহাসবিদ। সমকাল ও ভবিষ্যকালের জন্য অমর সব গ্রন্থের প্রণেতা হয়ে তিনি শ্রীরামকৃষ্ণ ভাবপ্রচার ও সঙ্ঘের বুনিয়াদ শক্তিশালী এবং ঐতিহাসিক ভিত্তিভূমির ওপর স্থাপন করে গেছেন।

অন্তর্মুখী জীবন ও ব্যক্তিত্বের সঙ্গে গ্রন্থের উপাদান সংগ্রহের বহির্মুখী কাজকে এক আশ্চর্য মেলবন্ধনে গ্রথিত করেছেন গম্ভীরানন্দজী। একথা প্রসিদ্ধ যে, অবতারপুরুষ সদলবলে ধর্মস্থাপনের জন্য আবির্ভূত হন। কিন্তু তাঁদের স্থূলশরীর অপ্রকট হওয়ার পরেও যুগাবতারের যুগ-উদ্দেশ্যসাধনের জন্য কালে কালে ঈশ্বরচিহ্নিত ব্যক্তিবর্গের আগমন হয়ে থাকে। স্বামী বিবেকানন্দ বলেছেন, "My men will come and they will work out my plans." অর্থাৎ "আমার ছেলেরা আসবে এবং তারাই আমার পরিকল্পনা বাস্তবে রূপায়িত করবে।" আমাদের বিশ্বাস, স্বামী গম্ভীরানন্দজী যুগাবতারের যুগ-উদ্দেশ্যসাধন এবং স্বামীজীর পরিকল্পনা রূপায়ণে এক বিশেষ চিহ্নিত ব্যক্তিত্ব।

অনন্ত ভাবময় শ্রীরামকৃষ্ণ। সেই অমূর্ত ভাবময়তার মূর্ত নিদর্শন হল সঙ্ঘ। ভাবে পরিপূর্ণ সঙ্ঘের মতাদর্শ, দর্শন এবং ইতিহাস। সেগুলিকে শ্রীরামকৃষ্ণের ত্যাগী ও গৃহী সন্তানরা যে-অবস্থায় রেখে গিয়েছিলেন, তারপর থেকে ইতিহাস ও যুগপ্রয়োজনে ঘটনাপ্রবাহকে লিপিবদ্ধ করা, ভাব ও মতাদর্শের বিচার-বিশ্লেষণ সমন্বিত একের পর এক অত্যাবশ্যক গ্রন্থ রচনা করে সঙ্ঘের ভিতের উপর দালান তৈরির কাজটিও গম্ভীরানন্দজী বহুলাংশে সমাধা করেছিলেন। তাঁর সম্পাদিত, সঙ্কলিত, অনূদিত ও রচিত পুস্তকগুলির তালিকা দেওয়া হল।

বাংলা গ্রন্থ

১। স্তবকুসুমাঞ্জলি (১৩৪৬), ২। উপনিষদ গ্রন্থাবলি : ১ম খণ্ড (১৩৪৮), ২য় খণ্ড (১৩৫০), ৩য় খণ্ড (১৩৫১), ৩। শ্রীরামকৃষ্ণ-ভক্তমালিকা—১ম ও ২য় খণ্ড (১৩৫৯), ৪। শ্রীমা সারদা দেবী (১৩৬০), ৫। সিদ্ধান্তলেশ সংগ্রহ (১৩৬৫), ৬। যুগনায়ক বিবেকানন্দ—১ম থেকে

৩য় খণ্ড (১৩৭৩), ৭। কঃ পন্থা (১৪০১)।

ইংরেজি গ্রন্থ

৮। Holy Mother Sri Sarada Devi (1955), ৯। History of Ramakrishna Math and Ramakrishna Mission (1957), ১০। Eight Upanishads–Vol. I (1957) Vol. II (1958) with Shankara's Commentary, ১১। Brahma Sutra Bhashya of Sri Shankara (1965), ১২। The Apostles of Sri Ramakrishna (1966), ১৩। Chhandogya Upanishad with Shankara's Commentary (1983), ১৪। The Bhagavad Gita with Shankara's Commentary (1984), এবং ১৫। Bhagavad Gita with the annotation (Gudhartha Dipika) of Madhusudana Sarasvati (1998). মহারাজের মহাপ্রয়াণের প্রায় দশ বছর পর গ্রন্থটি প্রকাশ পেয়েছিল।

উপরিউক্ত গ্রন্থগুলির মধ্যে বিশেষ কয়েকটির অভিনবত্ব এবং সঙ্ঘের তথা সর্বসাধারণের কাছে সেগুলির অপরিহার্যতা বিষয়ে সামান্য দৃষ্টিপাত করা যেতে পারে।

'স্তবকুসুমাঞ্জলি' :

সন্ন্যাসজীবনের প্রাথমিক পর্বের দেওঘর বিদ্যাপীঠের অধ্যক্ষতার গুরুভার বহন করার সময়ই মহারাজ জ্ঞান-ভক্তি প্রকাশক স্তব-স্তুতির আকর থেকে প্রয়োজনীয় বিষয় আহরণ করে মূল সংস্কৃতের সঙ্গে অন্বয় ও অনুবাদ করে সম্পাদনা করলেন 'স্তবকুসুমাঞ্জলি' গ্রন্থটি। রামকৃষ্ণ সঙ্ঘের তৎকালীন অধ্যক্ষ পূজনীয় স্বামী শুদ্ধানন্দজী অভিমত প্রকাশ করেছিলেন যে, স্তবের মূল সংস্কৃত মাত্র ছাপলেই সাধারণ পাঠকের পক্ষে যথেষ্ট হবে না; কেননা ছন্দ, অর্থবোধ, ভাবগাম্ভীর্য ও রসানুভূতি এই চার বস্তুর সমন্বয় হলেই স্তবের সম্পূর্ণ প্রভাব লক্ষিত হতে পারে। সে-অনুসারে এই গ্রন্থটিতে অন্বয়ার্থ ও বঙ্গানুবাদ দেওয়া হয়েছে।

পূজনীয় শুদ্ধানন্দজীর আর একটি ইচ্ছা ছিল যে, অনুবাদ যথাসম্ভব মূল সংস্কৃত অনুযায়ী হবে। স্তবাদির অনুবাদ সাধারণত ব্যাখ্যামূলক হয়ে থাকে। ফলে ভাবগ্রহণের সুবিধা হলেও যাঁরা মূল সংস্কৃত বুঝতে চান, তাঁদের অত্যন্ত অসুবিধা হয়। গ্রন্থটিতে অনুবাদের ক্ষেত্রে প্রাচীন টীকা ও ভাষ্যাদির সাহায্য নেওয়া হয়েছে এবং ভাষার স্বচ্ছন্দ গতি যথাসম্ভব রক্ষা করে তাকে সংস্কৃত মূলের অনুযায়ী করার চেষ্টা স্পষ্টত পরিলক্ষিত হয়।

স্তবকুসুমাঞ্জলির আর একটি বৈশিষ্ট্য, এতে সংহিতা এবং উপনিষদ থেকে প্রচুর সূক্ত ও শ্লোক অন্তর্ভুক্ত হয়েছে। স্বামীজীর বিশেষ আগ্রহ ছিল যে বঙ্গদেশে বেদ-বেদান্তের প্রচার হয়, অথচ দুর্মূল্য ও বিশাল বেদশাস্ত্র অধ্যয়ন করা অনেকের পক্ষেই দুষ্কর। এই গ্রন্থে বিখ্যাত সূক্তসমূহ এবং উপনিষদের প্রসিদ্ধ অংশগুলি নিবদ্ধ হওয়ায় এই অভাব অনেক পরিমাণে দূর হয়েছে বলে আশা করা যায়।

'শ্রীরামকৃষ্ণ-ভক্তমালিকা' :

স্বামী গম্ভীরানন্দজী যখন রামকৃষ্ণ-বিবেকানন্দ সাহিত্য-আঙিনায় রচনাকার ও মননশীল চিন্তাবিদরূপে প্রবেশ করেছেন, তার আগে শ্রীশ্রীরামকৃষ্ণকথামৃত, শ্রীশ্রীরামকৃষ্ণলীলাপ্রসঙ্গ এবং শ্রীশ্রীরামকৃষ্ণ-পুঁথি—শ্রীরামকৃষ্ণ-জীবনের এই তিনটি অমর আকরগ্রন্থ রচিত হয়েছে শ্রীরামকৃষ্ণের গৃহী ও ত্যাগী শিষ্যদের দ্বারা। মহারাজ অনুভব করলেন, এরপর আবশ্যক হল শ্রীরামকৃষ্ণের ত্যাগী ও গৃহী অন্তরঙ্গ সন্তানদের জীবনচরিত রচনা। শ্রীরামকৃষ্ণ-ভাবে ভরপুর শ্রীরামকৃষ্ণ-পার্ষদ ও পরিকরদের জীবন ও ইতিবৃত্তের মধ্য দিয়ে শ্রীরামকৃষ্ণ-ভাব ও মহিমাকে জনমানসে বিশেষত

সঙ্ঘের সদস্যদের কাছে ভাবাদর্শের বাস্তব বিচ্ছুরণসম্বলিত মহান জীবনগুলির উপস্থাপন হয়ে উঠল মহারাজের প্রধান কর্তব্য। তৎকালে লব্ধ উপাদান ও উপকরণের নিবিষ্ট গ্রন্থনায় রচিত হল এক যুগান্তকারী গ্রন্থ 'শ্রীরামকৃষ্ণ-ভক্তমালিকা'— দুটি পৃথক খণ্ডে (১৯৫২)। শ্রীরামকৃষ্ণ-জীবনের অফুরন্ত ভাবের প্রতিফলনে আলোকিত এক-একটি মৌলিক জীবন। শ্রীরামকৃষ্ণ-ভাবের মহিমা প্রকাশ ও প্রচারে প্রতিটি জীবন স্বাতন্ত্র্যে ভাস্বর। স্বামী গম্ভীরানন্দজীর গবেষণার গভীরতা ও উপকরণ সংগ্রহের প্রচণ্ড পরিশ্রমের ফল গ্রন্থটি। প্রসঙ্গের সার ছেঁকে পরিবেশন, বৈপরীত্যের কারণ প্রদর্শন, সন্দেহ নিরসন, পুনরুল্লেখ পরিহার, অলৌকিকত্বের ছোঁয়া এড়ানোর যথাসম্ভব সচেতন প্রচেষ্টা, আধ্যাত্মিক জীবনের সঙ্গে জাগতিক বাস্তবজীবনের মেলবন্ধন, আত্মপ্রচেষ্টা ও কৃপার যুগ্ম ভূমিকা, এবং সনাতন চিরায়ত ধর্মবিশ্বাস ও প্রথাদির পাশাপাশি বিচার-বিশ্লেষণী দৃষ্টিভঙ্গিতে জীবনচরিত রচনা গম্ভীরানন্দজীর রচনার বিশেষ শৈলী ও সৌষ্ঠব। পক্ষপাতহীন নিরপেক্ষ দৃষ্টিতে কোনও একটি জীবনের সঙ্গে অন্য কোনও জীবনের উচ্চাবচ তুলনা না করে প্রতিটি জীবনকে স্বীয় বিশিষ্ট মর্যাদায় রামকৃষ্ণাদর্শের এক-একটি বিশেষ আদলে পরিবেশন লেখকের সুচিন্তিত ইতিহাসচেতনার এক সুঋদ্ধ প্রকাশ। 'শ্রীরামকৃষ্ণ-ভক্তমালিকা' কেবল একটি গ্রন্থ তো নয়, এ যেন শ্রীরামকৃষ্ণ-পরিকরদের জীবনের পরতে পরতে শ্রীরামকৃষ্ণ-মহিমার দীপ্তিমালা মণিমাণিক্যে গাঁথা এক মোহন মালিকা। স্বামী গম্ভীরানন্দজী তার গ্রথয়িতা।

এখানে একটি ঘটনার উল্লেখ অপ্রাসঙ্গিক হবে না। এক সময় স্বামী চেতনানন্দজী পূজনীয় গম্ভীরানন্দজীকে বলেন যে, নতুন নতুন তথ্য প্রকাশিত হতে থাকায় শ্রীরামকৃষ্ণ-পরিকরদের যে জীবনবৃত্তান্ত 'ভক্তমালিকা'য় সন্নিবেশিত হয়েছে তা বর্তমানে অপ্রতুল বোধ হচ্ছে। পুরো বইটির অন্তর্ভুক্ত জীবনীগুলিকে নতুন তথ্যে পূর্ণ করে পরিমার্জনের সময় এসেছে। তাছাড়া আরও কিছু পরিকরদের জীবনী অন্তর্ভুক্ত হওয়ার দাবি এবং উপাদান রয়েছে। পূজ্যপাদ মহারাজ বলেন, "আমি যা করার করেছি। এরপর তোমরা করবে।" মহারাজজীর এই আকাঙ্ক্ষার ফসল স্বামী চেতনানন্দজীকৃত 'God Lived with Them' এবং 'They Lived with God' অসামান্য গ্রন্থ দুটি। লক্ষণীয়, গম্ভীরানন্দজী সবসময় মনে করতেন, সঙ্ঘের ইতিহাসে পথিকৃৎদের ভূমিকা ও অবদানেই ইতিহাসের গতিপথ স্তব্ধ হয়ে যাবে না। ইতিহাসের আপন গতিতে পরবর্তী প্রজন্মের বুদ্ধিদীপ্ত, পরিশ্রমী এবং যোগ্যতর সদস্যরা প্রয়োজনীয় অসম্পূর্ণতা দূর করে ইতিহাসকে সচল রাখবে ও সমসময়ের দৃষ্টিতে তথ্যের সমাবেশ এবং তত্ত্বের আদর্শানুগ ব্যাখ্যা প্রদানে সঙ্ঘকে গতিশীল রাখবে। এই দৃষ্টিভঙ্গির মধ্যে মহারাজজীর স্বভাবের দুটি গভীর প্রত্যয়ের আভাস পরিস্ফুট। এক, নিজের

সাধনরূপ অনাসক্তির পূর্ণতা এবং ভবিষ্য-প্রজন্মের উপর অগাধ আস্থা।

'শ্রীমা সারদা দেবী' :

দেখতে দেখতে শ্রীমা সারদা দেবীর জন্মশতবর্ষ এসে যাচ্ছে, তখনও শ্রীশ্রীমায়ের একটি প্রামাণ্য জীবনী লিখিত হয়নি। এই গুরুভারটিও অর্পিত হল গম্ভীরানন্দজীর ওপর। তাঁর সারস্বত সাধনার সর্বোৎকৃষ্ট ফল 'শ্রীমা সারদা দেবী' গ্রন্থটি প্রণয়ন। মায়ের সর্বাঙ্গসুন্দর জীবনকাহিনি জীবনীগ্রন্থের আঙ্গিকে এই প্রথম রচিত হল। এ যেন শ্রীশ্রীমায়ের জন্মশতবর্ষে সঙ্ঘের তরফে মায়ের পাদপদ্মে সর্বশ্রেষ্ঠ অর্ঘ্যটি নিবেদিত হল। গ্রন্থটির প্রারম্ভে শক্তির অবতরণের ব্যঞ্জনা, মানবীরূপ ধারণে দৈবী শক্তির সহজ সঞ্চালন, বিশেষত, শ্রীরামকৃষ্ণ-অবতারলীলায় জগৎকল্যাণরূপ ব্রতে বিভিন্ন ধারায় সক্রিয় অংশগ্রহণ অথচ অবগুণ্ঠিতা, মৃদুভাষিণী, লজ্জাশীলা অতুলনীয় মাতৃরূপের স্নিগ্ধ মাধুর্য, অন্তঃসলিলা ফল্গুর মতো সকলকে আপন করে নেওয়ার সর্বাশ্রয়ী শক্তির মানবলীলা এমন সুখপাঠ্য করে সুচারুরূপে লোকমানসে পরিস্ফুটন আর কোনও গ্রন্থে এমন যুক্তিবিচারের বিন্যাস ও নিরপেক্ষ মূল্যায়নের মাপকাঠিতে নিরূপিত হয়নি। মহারাজ নিজেই বলেছেন, শ্রীশ্রীমায়ের জীবনী লেখার আস্বাদ, তৃপ্তি ও আনন্দ তাঁর জীবনের সর্বোচ্চ প্রাপ্তি। বিবেকানন্দ-গবেষক শঙ্করীপ্রসাদ বসু মন্তব্য করেছেন, মহারাজ হয়তো জানেন না, তাঁরই মতো আমাদের সকলের কাছে তাঁর রচিত মায়ের জীবনীগ্রন্থটি সর্বোত্তমরূপে সমাদৃত ও সমভাবেই প্রেরণাপ্রদ। অনেকে তাঁকে প্রশ্ন করেছেন, ''আপনি কি শ্রীমাকে দর্শন করেছেন?'' শ্রীমাকে দর্শন ব্যতিরেকে এমন বই রচনা করা অসম্ভব—এ স্বাভাবিক ধারণা ছিল বহু মানুষের। মহারাজ এর উত্তরে বলেছেন, ''আমি মাকে চর্মচক্ষে দেখিনি; তাঁকে স্থূলশরীরে দর্শন করিনি। কিন্তু ধ্যান করলে শ্রীমায়ের ছবি ভেসে ওঠে মনে। তিনি আমার সঙ্গে সর্বদা আছেন।''

'যুগনায়ক বিবেকানন্দ' :

স্বামী বিবেকানন্দের জন্মশতবর্ষকে স্মরণ রেখে সঙ্ঘের সাহিত্য-আঙিনায় বাংলাভাষায় তাঁর একটি বিস্তৃত জীবনীগ্রন্থ প্রণয়নের তাগিদ স্বামী গম্ভীরানন্দজী অনুভব করেন। তার আগে ইংরেজিতে 'Life of Swami Vivekananda by his Eastern & Western Disciples' (দুখণ্ড) মায়াবতী অদ্বৈত আশ্রম থেকে এবং বাংলাভাষায় প্রমথনাথ বসু বিরচিত 'স্বামী বিবেকানন্দ' (দুখণ্ড) উদ্বোধন কার্যালয় থেকে প্রকাশিত হয়েছিল। কিন্তু তৎপরবর্তী কালে স্বামীজীর জীবন সম্পর্কিত গবেষণায় অনেক নতুন তথ্য এবং দৃষ্টিকোণের হদিশ মিলতে থাকে। সেগুলির পরম্পরা রক্ষা করে তিন খণ্ডে গ্রথিত হয় 'যুগনায়ক বিবেকানন্দ' গ্রন্থটি। প্রথম খণ্ডের প্রকাশকাল জুন ১৯৬৬, দ্বিতীয় খণ্ডের আগস্ট ১৯৬৬, শেষ তথা তৃতীয় খণ্ডের ফেব্রুয়ারি ১৯৬৭। অর্থাৎ এক বছরের কম সময়ের মধ্যেই তিনটি খণ্ড পাঠকের হাতে আসে। স্বামীজীর জীবনকাহিনি এবং একইসঙ্গে সঙ্ঘের বাস্তব রূপকার হিসেবে এই জীবনীগ্রন্থ প্রণয়ন মহারাজের এক অক্ষয় কীর্তি।

'প্রাগ্‌বাণী'তে লেখক জানিয়েছেন, প্রাক্-স্বাধীনতাযুগে স্বামীজীকে দেশবাসী যে-দৃষ্টিতে দেখেছেন, স্বাধীনতোত্তরকালে তা বদলে গেছে। বর্তমানে তাঁর জীবন ও বাণীর মধ্যে অন্যরূপ অর্থ ও সার্থকতার সন্ধান মিলেছে। অন্যদিকে দেখা যাচ্ছে, বিদেশে স্বামীজীর জীবন অধ্যাত্মচিন্তা ও আধ্যাত্মিক ভাব প্রচারে সর্বদা ব্যাপৃত ছিল; অন্যান্য যা কিছু তিনি করেছেন বা বলেছেন, তা ওই চিন্তা বা প্রচেষ্টার পরিপূরক বা তারই শাখাপ্রশাখা। পরন্তু

স্বামীজী শুধু ভারতের নন, তিনি সমগ্র বিশ্বের নায়ক। বর্তমান গ্রন্থে স্বামীজীর জীবনালোচনায় ঘটনাবলি মুখ্য ভূমিকা গ্রহণ করলেও স্থানে স্থানে ভাবের পরিপ্রেক্ষিতে সামঞ্জস্যপূর্ণ ঘটনাবলিকে বোঝার চেষ্টা করা হয়েছে। জীবনীটিকে গ্রন্থের অবয়বে পরিবেশন করতে তিনটি খণ্ডের তিনটি মূলভাবকে প্রস্তুতি, প্রচার ও প্রবর্তন—এইভাবে নামাঙ্কিত করা হয়েছে। বিভাগগুলি কখনই পরস্পর নিরপেক্ষ বিভাগ নয়, পরন্তু তাঁর জীবনের আদি, মধ্য ও অন্ত—এই পরম্পরা রক্ষা করে গ্রন্থিত।

শাস্ত্রগ্রন্থ :

ভারতীয় সনাতন শাস্ত্র ধর্ম, দর্শন ও আধ্যাত্মিকতার জীবন্ত আকর। তার মধ্যে প্রস্থানত্রয় বিশেষ উল্লেখযোগ্য। স্বামী গম্ভীরানন্দজীর যেকোনও কর্মপ্রচেষ্টার মধ্যে বিশেষ কোনও উদ্দেশ্যসাধনে তিনি তাতে প্রবৃত্ত হয়েছেন, স্পষ্ট লক্ষ করা যায়। শাস্ত্রগ্রন্থাদি পঠন-পাঠন, অনুবাদ-আলোচনার পিছনে ছিল স্বামী বিবেকানন্দের অনুপ্রেরণা। স্বামীজীর আপশোস ছিল যে, বঙ্গদেশে বেদান্তের প্রচার ও চর্চার খুবই অভাব। সেদিকটি সামান্য পূরণের ইচ্ছায় মহারাজ বিদ্যার্থীকাল থেকেই শাস্ত্রচর্চার সঙ্গে সঙ্গে প্রাথমিকভাবে বাংলাভাষা-ভাষীদের প্রয়োজন সিদ্ধ করতে অগ্রসর হয়েছিলেন। সেই কাজে তিনি একাধারে শাস্ত্রজ্ঞ ও মহাপণ্ডিত এবং লেখায় সিদ্ধহস্ত। উপনিষদ, গীতা ও ব্রহ্মসূত্রের অনুবাদ ও ব্যাখ্যায় নিয়োজিত হয়ে সঙ্ঘের সাহিত্যজগতে এক-একটি রত্নগ্রন্থের প্রণেতা হয়ে ওঠেন তিনি। তিন খণ্ডে সমাপ্ত বাংলা ভাষায় অনূদিত এগারোটি উপনিষদ তার প্রথম নিদর্শন। মন্ত্রানুযায়ী শব্দার্থ, অন্বয় ও বঙ্গানুবাদ প্রাঞ্জল। উপনিষদগুলির ইংরেজি মূলের সঙ্গে শাংকরভাষ্যের অনুবাদ সহ 'Eight Upanishads' (দুখণ্ড) এবং 'Chhandogya Upanishad' গ্রন্থগুলি লিখে ফেলেন।

নিজের শাস্ত্রচর্চার তাগিদে শ্রীমদ্ অপ্পয়দীক্ষিত বিরচিত 'সিদ্ধান্তলেশ-সংগ্রহ' অদ্বৈতবাদের একখানি অতি উপাদেয় এবং অভিনব সংগ্রহগ্রন্থের বাংলাভাষায় সটীক অনুবাদ করতে শুরু করেন গম্ভীরানন্দজী। শেষ হয় ১৯৫৮ খ্রিস্টাব্দে। বইটির স্থানে স্থানে গম্ভীর, সূক্ষ্ম ও বিস্তৃত আবশ্যকীয় আলোচনা দেখে তাঁর শাস্ত্রাদিতে ব্যাপক এবং সুশৃঙ্খল পাণ্ডিত্যে বিস্মিত না হয়ে পারা যায় না। এই পুস্তকটির মহারাজকৃত বঙ্গানুবাদই প্রথম। এজন্য তিনি ইংরেজি ও হিন্দি অনুবাদগ্রন্থ অধ্যয়ন করে বিষয়গুলির মর্মার্থ গ্রহণ করেছেন। বাংলাভাষায় এ-ধরনের গ্রন্থ দুর্লভ। অনুবাদকের শাস্ত্রজ্ঞান ও শাস্ত্রউপস্থাপনার ধরন সঙ্ঘভুক্ত শাস্ত্রামোদীদের যেমন উপকারে আসছে, তেমনই সঙ্ঘের বাইরের শাস্ত্রচর্চাকারীদের কাছেও অত্যন্ত আদরণীয় পুস্তকের অনুবাদকরূপে সঙ্ঘের মর্যাদাবৃদ্ধিকরণে এই অসাধারণ কৃতিত্ব চিরস্মরণীয় হয়ে থাকবে।

প্রস্থানত্রয়ের অন্যতম গ্রন্থ 'ব্রহ্মসূত্র' ইংরেজিতে অনুবাদ করার প্রয়োজনীয়তা অনুভব করেছিলেন গম্ভীরানন্দজী। কারণ পূর্ববর্তী দুটি ইংরেজি অনুবাদ-গ্রন্থ সহজলভ্য ছিল না এবং প্রাপ্ত হলেও অধিক মূল্যবশত সাধারণের পক্ষে ক্রয় করা সম্ভব ছিল না। উক্ত দুটি অসুবিধা দূর করতে ব্রহ্মসূত্রের মহারাজকৃত ইংরেজি অনুবাদ গ্রন্থাকারে প্রকাশিত হয় ১৯৬৫ খ্রিস্টাব্দে। গ্রন্থটির বিশেষত্ব হল—এতে প্রতিটি সূত্রের অন্তর্গত সংস্কৃত শব্দগুলিকে পৃথক করে ইংরেজি অনুবাদ দেখানো আছে, মূল সূত্রের অনুবাদের সঙ্গে সহজবোধ্য করার জন্য সংক্ষিপ্তাকারে প্রয়োজনীয় অতিরিক্ত বাক্য বা অর্ধবাক্য বন্ধনীতে ব্যবহার করা হয়েছে। তাছাড়া, যে-সন্দেহ সূত্রের মধ্যে দেখা গেছে, সে-বিষয়ে পূর্বপক্ষীয় আপত্তি প্রদর্শন করা ও বেদান্তীর উত্তর

স্পষ্ট করে বোঝার উদ্দেশ্যে আলাদা আলাদা করে উপস্থাপন করা হয়েছে ভাষ্যানুবাদের তর্জমায়। ভাষান্তরে মূলত 'রত্নপ্রভা' টীকাকে অনুসরণ করা হয়েছে। সঙ্গে প্রয়োজনমতো 'ন্যায়নির্ণয়' ও 'ভামতী' টীকার সাহায্য মাঝে মধ্যে গৃহীত হয়েছে। মূল সংস্কৃত শব্দগুলির ইংরেজি লিখনে উচ্চারণবিধির চিহ্ন ব্যবহৃত হয়েছে। দুর্বোধ্য কিংবা ক্লেশকর স্থানে গ্রন্থপ্রণেতা বিষয়গুলিকে প্রাঞ্জল ও সাবলীল করতে অপরিহার্য ব্যাখ্যা সংযোজন করে মূলভাবনাকে সুখপাঠ্য করে তুলেছেন। সমস্ত সূত্রকে প্রকরণানুসারে বিভক্ত করে এই বিশাল বেদান্তদর্শন পুস্তকটির বিষয়বস্তুর একমুখিনতা ও একরূপতায় যাতে পাঠক মনোনিবেশ করতে পারেন, তার প্রচেষ্টাও করেছেন।

মহারাজ এরপর যে-দুটি গ্রন্থ ইংরেজিতে অনুবাদ করেন সে-দুটিই গীতার উপর। প্রথমটি 'The Bhagavat Gita with Shankara's Commentary' প্রকাশিত হয় ১৯৮৪ খ্রিস্টাব্দে। গ্রন্থটি বর্তমানে নাগপুর বিশ্ববিদ্যালয়ে দর্শন বিভাগে পাঠ্যপুস্তক হিসেবে ব্যবহৃত হচ্ছে।

স্বামী গম্ভীরানন্দজীর জীবনের বৌদ্ধিক সিদ্ধির সর্বশেষ ও অত্যুৎকৃষ্ট অবদান—ভারতীয় দর্শনাকাশের অন্যতম উজ্জ্বল নক্ষত্র শ্রীমন্ মধুসূদন সরস্বতীকৃত গীতার বিশাল অথচ শাস্ত্রের কাঠিন্য পরিহৃত পর্যালোচনায় পূর্ণ, মধুর ভঙ্গিমা ও শৈলীতে রচিত 'গূঢ়ার্থদীপিকা'র এক অসাধারণ অসমসাহসী ইংরেজি অনুবাদগ্রন্থ। জীবন-উপান্তে দীর্ঘ বারো বছর—সাধারণ সম্পাদক পদে তিনবছর, সহাধ্যক্ষকালের ছ-বছর এবং সঙ্ঘাধ্যক্ষপদে আসীন থাকার প্রায় তিন বছর তিনি এই মহাগ্রন্থটির অনুবাদে ব্যাপৃত ছিলেন। তাঁর মহাসমাধির মাত্র চার মাস আগে গ্রন্থটির রচনা সমাপ্ত হয়।

বারবারই লক্ষ করা গেছে পূজ্যপাদ মহারাজের প্রতিটি কর্মসাধনার পশ্চাতে ছিল সঙ্ঘের ভাবগত এবং বাহ্য প্রয়োজন পূরণের প্রচেষ্টা। কোনও অসম্পূর্ণতা বা অপূর্ণতাকে পূর্ণ করার সঙ্গে সঙ্গে ভাবাদর্শের অনুকূল বিষয়কে শাস্ত্রীয় প্রামাণ্যের মাপকাঠিতে উপস্থাপনা ছিল মহারাজের একটি বিশেষ দৃষ্টিভঙ্গি। শাস্ত্রের সারগ্রন্থ গীতা। তার উপর ভাষ্য-টীকা-টিপ্পনী রচনা কালাতিক্রমণীয় একটি বিষয়। শাংকরভাষ্যের ইংরেজি অনুবাদগ্রন্থ প্রণয়নের মধ্য দিয়ে অদ্বৈতভাবের অকাট্য যুক্তিনির্ভর মতবাদকে ইতঃপূর্বে মহারাজ পরিবেশন করেছেন। অন্যদিকে, নিজে শ্রীরামকৃষ্ণ-ভাবাবলম্বী এবং রামকৃষ্ণ সঙ্ঘের অন্যতম শ্রেষ্ঠ বৌদ্ধিক ব্যক্তিত্ব হওয়ার কারণে ভারতীয় টীকাকারদের মধ্যে শ্রীরামকৃষ্ণের সমন্বয়ী চিন্তাভাবনার অতি-সন্নিকর্ষে অবস্থিত মধুসূদনের টীকাকে ভাষান্তর করার দুরূহ কার্যটি সুসম্পন্ন করে তিনি শ্রীরামকৃষ্ণ-দর্শনের সমন্বয়ী বার্তার পশ্চাতে মূল শাস্ত্র ও বর্তমান টীকাকারের প্রামাণ্যে সাদৃশ্য স্পষ্ট করতে সফল হয়েছেন। মহারাজ স্পষ্টতই অনুভব করেছেন, শাংকরভাষ্যের পরই বোধসৌকর্য, গভীরতা এবং মৌলিকতায় মধুসূদন সরস্বতীর টীকা 'গূঢ়ার্থদীপিকা' অনন্যসাধারণ এবং সেটি টীকাকারের নিজ আধ্যাত্মিক অনুভূতির চেতনায় সম্পৃক্ত। অসীম পাণ্ডিত্য, ষড়দর্শনের বিভিন্ন মতবাদের নিষ্কর্ষে মূলভাব আত্তীকরণে প্রবুদ্ধ মানসিকতা এবং শাস্ত্রচর্চার প্রকৃত উদ্দেশ্য যে আধ্যাত্মিক সত্য ও তত্ত্বের স্বীয় জীবনে অভিজ্ঞতালাভ—এসবই প্রকাশিত হয়েছে শ্রীমধুসূদন বিরচিত টীকাটিতে।

স্বামীজী মত প্রকাশ করেছেন যে, শ্রীরামকৃষ্ণের মতো সুসমন্বিত জীবন আগে কখনও আসেনি। চারটি যোগের সুষ্ঠু সমন্বয়ে সুগঠিত জীবনই আধুনিক কালের আদর্শ। স্বামী গম্ভীরানন্দজী বিশেষ করে বক্তৃতা ও আলোচনাতে নির্দ্বিধায় প্রকাশ করতেন যে, আচার্য শংকরের মতো অদ্বৈতবাদ প্রতিষ্ঠাপক ভক্তিকে মোটেই অস্বীকার করেননি।

মধুসূদন সরস্বতীর রচিত বলে প্রচলিত একটি শ্লোক মহারাজের খুব প্রিয় ছিল। মধুসূদনের মতো বিরাট অদ্বৈতবাদী বলেছেন,

“অদ্বৈতসাম্রাজ্যপথাধিরঢ়া-
স্তৃণীকৃতাখণ্ডলবৈভবাশ্চ।
তথাপি কেনাপি বয়ং শঠেন
দাসীকৃতা গোপবধূবিটেন॥”

—“আমরা অদ্বৈতসাম্রাজ্যপথের যাত্রী, ইন্দ্রের বৈভবকেও তৃণের মতো তুচ্ছজ্ঞানে আমরা অস্বীকার করেছি। তবুও গোপবধূদের হৃদয়হরণকারী শঠ শ্রীকৃষ্ণ আমাদের দাসী করে রেখেছেন।” শ্রীরামকৃষ্ণের ভাব ও দর্শনের অন্যতম বোদ্ধা ও বিশ্লেষক গম্ভীরানন্দজীর মূল্যায়ন বহু ভ্রান্ত ও সন্দিগ্ধ মানুষের কাছে রামকৃষ্ণ-ভাবাদর্শের লক্ষ্য ও উদ্দেশ্যকে দৃঢ় করে দর্শনের বিভিন্ন মতবাদের মধ্যে সমন্বয়কারী শ্রীরামকৃষ্ণকে অবধারণ করতে চিরকাল প্রেরণা জোগাবে। উল্লেখ্য, গম্ভীরানন্দজী কৃত অনুবাদগ্রন্থটি অক্সফোর্ড বিশ্ববিদ্যালয়ের দর্শন বিভাগের রেফারেন্স বই হিসেবে গৃহীত হয়েছে।

ইতিহাসবিদ

রামকৃষ্ণ সঙ্ঘ এক ঐতিহাসিক প্রতিষ্ঠান। পূর্বকালের মতো অরণ্য বা গিরিগুহার বদলে সমাজ-সংসারে লোকচক্ষুর গোচরে যাপিত কিছু আশ্চর্য সংকল্পবদ্ধ ব্যক্তিদের ত্যাগ, তপস্যা ও কৃচ্ছ্রতার পরিণাম এই সঙ্ঘ। প্রতিটি প্রচেষ্টা, উদ্যোগ, সাফল্য, অসাফল্য সবই এক্ষেত্রে বাস্তবে সংঘটিত ইতিহাসনির্ভর ঘটনা। ভাবাদর্শের নিরিখে ফলিত কাজকর্মের ক্ষেত্রে যা কিছু প্রয়াস করা হয়েছে, সবই কালের কপোলে দৃঢ়াঙ্কিত হয়ে রয়েছে। লেখালেখি, ভাষণ, বক্তৃতা বা ঘটনাবলির উপস্থাপনে এক্ষেত্রে কল্পনা বা অনুমানের কোনও স্থান নেই। সর্বপ্রকার উপস্থাপনকেই হতে হবে তথ্যভিত্তিক ঘটনাবলির পুনঃকথন। পথিকৃৎদের জীবন ও বাণী, পথচলার গতি-প্রকৃতি, জয়-বিজয়ের প্রেক্ষা, ভাবগ্রহণের সামাজিক ও ধর্মীয় মাত্রা ও পরিণতি—সবই ঘটে-যাওয়া ঘটনার পুনর্লিখন। সেখানে তত্ত্ব ও তথ্যের সত্যতা, পরিচ্ছন্নতা, নিরপেক্ষতা, মেরুকরণ ও আবেগবর্জিত মনোভাব, আবার সত্যপ্রকাশে প্রয়োজনীয় আবেগ ও উচ্ছ্বাসকে পরিমিত রাখা—এসবই আবশ্যক হয়ে ওঠে। যেকোনও ভাবান্দোলনের অগ্রগতির পথে অনিবার্যভাবে পথ রুদ্ধ করে থাকে বাধাবিপত্তি, বিরুদ্ধাচরণ, মতানৈক্য, নিন্দা, সমালোচনা, কুৎসারটনা ইত্যাদি।

ইতিহাসের গতি শুধুমাত্র উন্নতির মহিমা বা গৌরবগাথা খ্যাপন (glorification) কিংবা কেবলমাত্র উচ্চমুখী প্রগতিরেখা (straight-line rise) অঙ্কন নয়। ইতিহাসের সর্পিল পথে থাকে বিপর্যয়, ভুলভ্রান্তি, পরীক্ষানিরীক্ষার নিরিখে সম্ভাব্য ফললাভে ব্যর্থতা অথবা আশানুরূপ ফললাভ না করা ইত্যাদি বিপরীতমুখী প্রতিকূলতা। বস্তুত এ-সমস্ত বিরুদ্ধতাকে আত্মবল, সঙ্ঘশক্তি, আদর্শ ও উদ্দেশ্যের সততা ও একমুখী নাছোড় নিরলস প্রয়াসের ধারা প্রতিহত করার মধ্যেই লুকিয়ে থাকে যেকোনও প্রতিষ্ঠানের মহিমময় ইতিহাস। উত্থান-পতন বা সাফল্য-অসাফল্যকে অধিক গুরুত্ব না দিয়ে আদর্শানুগ উদ্দিষ্ট পথে অগ্রগামী হওয়ার তীব্র আকাঙ্ক্ষাই পরিশেষে ফলদান করে। রামকৃষ্ণ সঙ্ঘের ক্ষেত্রে এ-পর্যন্ত বিজয় ও সাফল্যই সূচিত হয়েছে বিগত একশো পঁচিশ বছরের নিরবচ্ছিন্ন পরিক্রমায়। প্রথম সাতটি দশকের সঙ্ঘের ইতিহাস রচনাকার, গবেষক, লেখক ও দিগ্‌দর্শনকারী ব্যক্তিত্বের এক কিংবদন্তি পুরুষ স্বামী গম্ভীরানন্দজী। সত্যকে লঘু করা কিংবা লুকিয়ে রাখার অপচেষ্টা তাঁর ইতিহাসবোধের ত্রিসীমানায় ছিল না। কত ভয়াল তরঙ্গের উচ্ছ্বাসে সঙ্ঘরূপ বিশাল তরী কালসমুদ্র অতিক্রম করে সাফল্যের তীরে যুগের

পর যুগ, শতকের পর শতক ধরে এগিয়ে যায় তার রূপরেখা, চিন্তন-মননের শৈলী ও রচনার সৌষ্ঠবে তিনি তা ভবিষ্যতের জন্য সুবিন্যস্তভাবে সংরক্ষিত করে গেছেন। জীবনচরিত রচনা ও ইতিহাস রক্ষণে তিনি বিশ্বমানের এক সৃজনশীল লেখক ও উপস্থাপক। তাঁর পথপ্রদর্শনের বিশিষ্টতা ও দৃষ্টিভঙ্গি অনুধাবন ও অনুসরণ করাই ভবিষ্য লেখক ও ঐতিহাসিকদের পথরেখা। এ-বিষয়ে গম্ভীরানন্দজী এক ব্যতিক্রমী ব্যক্তিত্ব ও পুরোধা পুরুষ।

কেবলমাত্র 'History of The Ramakrishna Math and Ramakrishna Mission' গ্রন্থটির প্রণয়নকর্তা হিসেবেই তিনি ইতিহাসকার নন। শ্রীরামকৃষ্ণের ত্যাগী ও গৃহী অন্তরঙ্গ পার্ষদদের অসাধারণ জীবনালেখ্য 'শ্রীরামকৃষ্ণ-ভক্তমালিকা', 'শ্রীমা সারদা দেবী' শীর্ষক শ্রীমায়ের অনন্য জীবনীগ্রন্থ, স্বামী বিবেকানন্দের জীবনবৃত্তান্ত সম্বলিত গবেষণাঋদ্ধ 'যুগনায়ক বিবেকানন্দ' ইত্যাদি গ্রন্থের প্রতিটি বাক্যই রামকৃষ্ণ সঙ্ঘের ইতিহাস লিখন। সেখানে বর্ণিত প্রতিটি জীবন ও চরিত্রই জনমানসে রামকৃষ্ণ-ভাবান্দোলনের এক-একটি শক্তিশালী স্তম্ভ। তাঁদের জীবনই ভাবাদর্শের নিরিখে যাপিত ইতিহাসের এক-একটি অধ্যায়। তাঁদের জীবনরূপ অনন্য মানবমূর্তির একদিকে লক্ষিত যুগাদর্শ এবং অপরদিকে সে-আদর্শের ঘনীভূত প্রায়োগিক রূপটি যেন চিত্রিত। প্রতিটি জীবনই এই দুটি উদ্দেশ্য সাধন করে বাস্তবনির্ভর ইতিহাসকে অতি প্রাণবন্ত করে সঙ্ঘের একটি সমষ্টিরূপের আদল দিয়ে চলেছে। এই বিচিত্র চালচিত্রটি প্রতিটি যুগাকাশের দিগন্তবলয়ে উজ্জ্বল রামধনুর মতো বহু রঙে রঞ্জিত রংগুলির সহাবস্থানকে স্বতই স্বীকৃতি দিয়ে চলবে।

গম্ভীরানন্দজীর ইতিহাস রচনার বৈশিষ্ট্য

ইতিহাসের গতিপথে প্রতিটি বাঁক বিচার-বিশ্লেষণ করে সংক্ষেপে প্রয়োজনীয় বিষয় লিপিবদ্ধ করা ছিল পূজ্যপাদ মহারাজজীর রচনাধারার বিশেষত্ব। মূল লক্ষ্য থাকত ভাবাদর্শ ও মতবাদ প্রতিষ্ঠায় এবং আন্দোলনের অগ্রগতির বা পশ্চাৎপথ অভিমুখের মাইলফলক অনুসন্ধান। অনেকের চোখে কোনও ঘটনা বা বিষয়বস্তু নগণ্য বা তুচ্ছ বলে মনে হলেও মহারাজ সেগুলির মধ্যে ইতিহাসের সূচকমূলক রসদ পেলে তা সংরক্ষণ করতে উদাসীন অথবা নিস্পৃহ থাকতেন না।

একটি ঘটনার উল্লেখ করা যেতে পারে। সেটি স্বামীজীর জীবন সম্পর্কিত। ১৮৯৯ খ্রিস্টাব্দে স্বামীজী বায়ুপরিবর্তনে বৈদ্যনাথধামে গিয়েছিলেন। কিন্তু সেখানে গিয়ে প্রচণ্ড শ্বাসকষ্টে তাঁর প্রাণ যায় যায় হয়েছিল। যুগনায়ক তৃতীয় খণ্ডে সে-প্রসঙ্গে মহারাজ লিখেছেন : ''দেওঘরের অসুখের সংবাদ আমরা মহিষাদলের রাজার ম্যানেজার শ্রীযুক্ত শচীন্দ্রনাথ বসু মহাশয়ের পত্রাংশ হইতেও পাই।'' মূল জীবনী অংশে এই একটি বাক্যের সঙ্গে পাদটীকায় লিখলেন একটি অন্য ঘটনা। সেটি সম্পূর্ণ উদ্ধৃত করা যাক : ''শচীনবাবুর চিঠিতে একটা মজার খবরও পাওয়া যায়। উহার সহিত স্বামীজীর জীবনের সাক্ষাৎ সম্বন্ধ না থাকলেও আমরা এই জন্য উল্লেখ করিতেছি যে, উক্ত ঘটনা স্বামীজীর কার্যক্ষেত্রের স্বরূপটি আমাদের সম্মুখে তুলিয়া ধরে। ঐ পত্রাংশে আছে : 'গরীব রামকৃষ্ণ সভা is an association recently started by the গৃহীভক্ত's (disciples) as a sister one of the Ramakrishna Mission of Baghbazar. But the Swamijis don't approve of it, they look upon it as a rival association likely to hamper the smooth working of the Ramakrishna Mission. There is a danger of a split in the camp. The সন্ন্যাসী's and গৃহীভক্ত's were never so opposed to each

other.' তাঁহার ১৬ মার্চের পত্রাংশে আছে যে, গিরীন্দ্রবাবু, হরমোহনবাবু প্রভৃতি সেবারে ঠাকুরের উৎসবে মঠে যান নাই—আলাদা উৎসব করিয়াছিলেন; 'এদিকে গৃহীদের সহিত breach খুব wide হইতে চলিল।' অবশ্য শচীনবাবু এই বিচ্ছেদকে বড় করিয়া দেখিতেছিলেন—পরবর্তী ইতিহাস তাঁহার ভয়ের সত্যতা প্রমাণ করে নাই।"

স্বামী বিবেকানন্দের ছিল বিশ্ব-ইতিহাস পাঠের প্রয়োজনীয় অনুসন্ধিৎসু একটি মন। তাঁর ইতিহাসজ্ঞান রামকৃষ্ণ ভাবান্দোলনের সৃষ্টি থেকেই বহু অভিনব বিষয়কে যেমন সমাদরে গ্রহণ করেছে, তেমনই বিপজ্জনক বিষয়কে ভবিষ্য সভ্যতার তাগিদে পরিহার করেছে অবলীলায়। এমন পুরোধার পদচিহ্ন অনুসরণ করে গম্ভীরানন্দজী 'History of The Ramakrishna Math and Ramakrishna Mission' গ্রন্থটির প্রথম সংস্করণ প্রকাশ করেন ১৯৫৭ খ্রিস্টাব্দে। তাঁর জীবদ্দশার শেষের দিকে ১৯৮৩ খ্রিস্টাব্দে তৃতীয় পরিমার্জিত সংস্করণটি প্রকাশিত হয়। শ্রীরামকৃষ্ণের আবির্ভাবের বছর থেকে তাঁর মর্ত্যজীবনালোকে 'অনুপ্রেরণা' শীর্ষক অধ্যায়ে লিপিবদ্ধ করে গ্রন্থটি শুরু করেন তিনি। শ্রীরামকৃষ্ণের মহাপ্রয়াণের বছর (১৮৮৬) থেকে মূল ইতিহাস লিপিবদ্ধ হতে থাকে দ্বিতীয় অধ্যায় 'প্রবর্তন' শীর্ষক নামকরণে। শেষ সংস্করণে ১৯৮০ খ্রিস্টাব্দে অনুষ্ঠিত সঙ্ঘের দ্বিতীয় মহাসম্মেলনের বিবরণ পর্যন্ত তিনি সংক্ষিপ্তাকারে লিপিবদ্ধ করে যান। অর্থাৎ প্রায় একটি শতাব্দীর ইতিহাস। সংক্ষেপে হলেও পরম্পরাক্রমে অত্যাবশ্যক ঘটনার উল্লেখ তাতে স্থান পেয়েছে।

আগেই বলা হয়েছে, ইতিহাসকারদের কাজই হল উত্থান-পতন, সাফল্য-সংকটকে চিহ্নিত করা। ভারতীয় ঐতিহাসিকদের মধ্যে যদুনাথ সরকার, রমেশচন্দ্র দত্ত, রমেশচন্দ্র মজুমদার, রোমিলা থাপার, তপন রায়চৌধুরী, রামচন্দ্র গুহ ভারতবর্ষের ইতিহাস রচনায় পৃথিবীর ইতিহাসবিদদের উপরিউক্ত ধারণার বশবর্তী হয়েই চলেছেন এবং ইতিহাস থেকে শিক্ষা গ্রহণ করেই ভবিষ্যৎ সমাজ-সভ্যতা গড়ে উঠবে—সে-আশাই পোষণ করেছেন। প্রায় সত্তর বছর আগে রামকৃষ্ণ সঙ্ঘের ইতিহাসরচনায় স্বামী গম্ভীরানন্দজী উক্ত পথাদর্শকেই অনুসরণ করে আপন মৌলিকতায় রামকৃষ্ণ ভাবান্দোলনের বীজ উপ্ত হওয়া থেকে বিশাল মহীরুহ হওয়ার আভাস লিপিবদ্ধ করে গেছেন। এরপর থেকে ইতিহাস রচনার উপাদান-উপকরণ, বিচার-বিশ্লেষণে তাঁর দৃষ্টিভঙ্গিকে অনুসরণ করাই পরবর্তী ইতিহাসকারদের একমাত্র কাজ। সঙ্গে থাকবে অবশ্যই মৌলিকতা।

সঙ্ঘের প্রতি স্বামীজীর একটি যুগান্তকারী নির্দেশ ছিল যে, কোনও সদস্য এবং সঙ্ঘ রাজনীতির সঙ্গে প্রত্যক্ষ সংস্রব রাখবে না। সেই নির্দেশকে মান্যতা দিয়ে ভগিনী নিবেদিতা, জাতীয়তাবাদী আন্দোলনে জড়িয়ে পড়ার কারণে, সঙ্ঘের সঙ্গে প্রাতিষ্ঠানিক বিচ্ছেদকে স্বেচ্ছায় বরণ করে নেন। সমকালে বিষয়টি নিয়ে সঙ্ঘকে অনেক বিতর্ক ও কুৎসার সম্মুখীন হতে হয়। ইতিহাসে স্থানিক বা কালিক উত্তেজনা পেরিয়ে যাওয়ার অনেক পরে সেই নির্দিষ্ট কালের ঘটনাপ্রবাহের মধ্যে যে-কল্যাণকর আভাস পাওয়া যায়, তাই হল ইতিহাসচর্চার শুভ দিক। স্বামীজী নিবেদিতাকে এনেছিলেন রামকৃষ্ণ সঙ্ঘের জন্য নয়—ভারতবর্ষের জন্য। শুধুমাত্র সঙ্ঘের কাজকর্মে নিজেকে ব্যাপৃত রাখার জীবন তাঁর নয়। তিনি সর্বস্ব দিয়েছিলেন ভারতবর্ষের জন্য; কেবলমাত্র সঙ্ঘের সেবা করলে তাঁর সর্বস্ব দেওয়া হত না। গম্ভীরানন্দজী উক্ত ঘটনাটি উল্লেখ করে যে-মন্তব্য লিপিবদ্ধ করেছেন, তাতে এই অসাধারণ ইঙ্গিত লক্ষ করা যায়।

১৯২১ খ্রিস্টাব্দে কাশী সেবাশ্রমের সাধুদের মধ্যে মনোমালিন্য ও রাজা মহারাজের উপস্থিতিতে আধ্যাত্মিক আবহে অপ্রীতিকর পরিস্থিতির অবসান,

বছর দুই পরে অভেদানন্দজীর বেলুড় মঠ থেকে পৃথক প্রতিষ্ঠান গঠন, বছর তিনেক পর 'মায়ের বাড়ি' তথা 'উদ্বোধন' কেন্দ্রে ব্রহ্মচারী গণেন্দ্রনাথ সংক্রান্ত ও বেঙ্গালুরু মঠে স্বামী নির্মলানন্দ সংক্রান্ত সংকট—গম্ভীরানন্দজী এই সবকিছুই বিশ্বস্ততা ও পরিচ্ছন্ন ঐতিহাসিক তথ্যের ভিত্তিতে তাঁর গ্রন্থে সংক্ষিপ্তাকারে লিপিবদ্ধ করে গেছেন। প্রতিটি ক্ষেত্রেই সঙ্ঘের আদর্শ, উদ্দেশ্য ও ন্যায়পথে বাস্তবরূপ প্রদানের ক্ষেত্রে যে-সংকট, প্রতিকূলতা, বিরুদ্ধতা দেখা দিয়েছিল সেগুলি দেখিয়েছেন; পরিশেষে যে ন্যায় ও সত্যেরই জয় হয়েছিল তা প্রদর্শন করেছেন; এবং উক্ত ঘটনাগুলি থেকে ভবিষ্যকাল শিক্ষণীয় ও অনুসরণীয় পাথেয় যাতে পায় তার ব্যবস্থা করে গেছেন।

মননে মৌলিকতা

স্বামীজী চেয়েছেন মৌলিকতার পরিসরে ব্যাপ্তি ও গভীরতার সহাবস্থান। স্বামী গম্ভীরানন্দজীর যেমন ছিল সৃজনশীল সহজাত প্রতিভা তেমনই বিদ্যুচ্চমকের মতো মৌলিক ভাবনার বিচ্ছুরণ। তাঁর মতে, ধর্মের যে-রূপ স্বামীজীর চিত্তে উদ্ভাসিত হয়েছিল তা গতানুগতিকের পুনরাবৃত্তি নয়। ধর্মের ভাবনাকে যেভাবে তিনি স্থাপন করেছেন, তা অনেকাংশেই অভিনব, অথচ কোনও অংশেই তা হিন্দু মত বা বেদান্তের বহির্ভূত নয়। এ-পর্যন্ত শাস্ত্রগ্রন্থের ভাষ্যটীকাদিতে একই ব্যক্তির জীবনে জ্ঞান-ভক্তি-কর্ম-যোগের সমন্বয় সাধন বিষয়ে বিশেষ চেষ্টা পরিলক্ষিত হয় না, বরং মনে করা হত এগুলি পরস্পর-নিরপেক্ষ, এমনকী পরস্পরবিরোধী সাধনমার্গ। কিন্তু শ্রীরামকৃষ্ণের শিক্ষাবলম্বনে স্বামীজী দেখলেন, মানুষের জীবনকে এমন একটা কৃত্রিমভাবে বিভক্ত করা চলে না। ব্যক্তিবিশেষের জীবনে চারটি যোগের কোনও একটির প্রাধান্য থাকলেও প্রকৃত চরিত্র এইগুলির সমন্বয়েই গঠিত—সকলেরই জীবনে থাকে অল্পাধিক বিচার, ভক্তি, সৎকর্মস্পৃহা ও নীরব ধ্যানপরায়ণতা। সুতরাং স্বামীজী স্পষ্ট নির্দেশ দিলেন যে, তাঁর পরিকল্পিত মঠজীবনে এই চারমার্গেরই সমন্বয় ঘটবে—শুধু সামূহিকভাবে সমাজ বা সম্প্রদায়ের মধ্যে নয়, প্রতিটি ব্যক্তিজীবনেও বটে। শ্রীরামকৃষ্ণ-কথিত 'শিবজ্ঞানে জীবসেবা', 'অদ্বৈতজ্ঞান আঁচলে বেঁধে যা ইচ্ছা তাই কর'; কর্মবিভাগের কার্য প্রত্যেকেরই কিছু না কিছু করতে হবে বলে স্বামীজীর নির্দেশ, নিষ্কাম কর্ম তথা কর্মযোগ অবলম্বনে কর্ম করা, এবারে নতুন পথ করে যাওয়া ইত্যাদি কথায় বা পরিভাষায় কর্মসাধনাকে নিজ শাস্ত্রজ্ঞানের নির্যাসরূপে পূজ্যপাদ গম্ভীরানন্দজী বিস্তৃত পর্যালোচনা করেছেন। তা থেকে সংক্ষিপ্তাকারে মহারাজের মৌলিক দৃষ্টি ও অনুপম সিদ্ধান্তটি উদ্ধৃত করা যেতে পারে: ''স্বামীজীর পরিকল্পিত কর্মমার্গকে কিন্তু কর্মযোগের সমার্থক বলিয়া গ্রহণ করা চলে না। কর্মযোগে ঈশ্বরার্থে ফলার্পণের নির্দেশ আছে; স্বামীজীর 'কার্যে পরিণত বেদান্ত'-এ নিজের জন্য ফল অর্জনান্তে ভগবানকে অর্পণের কথাই উঠে না; কারণ এখানে আদ্যন্ত সমস্ত প্রচেষ্টাই ভগবানের জন্য—ফলোৎপত্তির পূর্বেও উহা ভগবানের, মধ্যাবস্থায়ও ভগবানের এবং সমাপ্তিতেও ভগবানের। শিবজ্ঞানে জীবের সেবার মূল কথাই তাই; এখানে স্বার্থচিন্তার অবকাশ নাই। তারপর কর্ম বলিতে টীকাকার ও ভাষ্যকারগণ যাগযজ্ঞ ও ইষ্টাপূর্তাদি শাস্ত্রীয় ক্রিয়াকাণ্ডকেই বুঝিয়েছেন। স্বামীজীর মতে যে কোনও সৎ কর্মকেই ঈশ্বরাধনার অবলম্বনরূপে গ্রহণ করা চলে; কর্মমাত্রকেই পূজায় পরিণত করা চলে, অধিকন্তু ঈশ্বর যদি মন্দিরে বা মঠে সাধককে দর্শন দিয়া তৃপ্ত করেন, তবে তিনি চাষার গোলাবাড়ির আঙিনায় কিংবা শ্রমিকের কারখানার দরজায় দেখা দিবেন না, ইহার সপক্ষে কোন যুক্তি নাই। প্রাচীন সাধক

মণ্ডলীতেও ইহা স্বীকৃত যে, ভগবানকে সরল মনে ঐকান্তিক ভক্তিভরে ডাকিলে তিনি সর্বত্র সর্বপথে আবির্ভূত হইয়া থাকেন। আর ইহাই শ্রীরামকৃষ্ণোপলব্ধ সমন্বয়ের মর্মকথা। আবার পূর্বসূরীদের মতে কর্মের দ্বারা চিত্তশুদ্ধি হইলে ভক্তিলাভ ও ভক্তি পরিপক্ক হইলে জ্ঞানলাভ হয়। কিন্তু মতবাদ হিসাবে এই তত্ত্বের প্রতি অগ্রসর না হইয়া স্বামীজী বাস্তব সাধকজীবন ও সিদ্ধির আলোকসম্পাতে দেখিলেন কার্যে পরিণত বেদান্তেরই মধ্যে এমনভাবে চতুর্মার্গের সমন্বয় ঘটিয়াছে এবং পরার্থে কর্মব্যাপৃত থাকার সমকালেই ভক্তি জ্ঞান ও ধ্যানের এমন উৎকর্ষ সাধিত হইতে পারে যে, কার্যে পরিণত বেদান্ত হইতে শুধু পরম্পরাক্রমে নহে, প্রত্যুত সাক্ষাৎভাবেও মুক্তিফল আসিতে পারে।... মনে রাখিতে হইবে... কর্মাকারে অভিব্যক্ত ও উপলব্ধমান অদ্বৈতজ্ঞান হইতে মুক্তির কথাই বলিতেছি।"

স্বামীজীর নতুন নির্দেশিত পথটি হল—অপরের সেবা করে এখনকার ছেলেমেয়েরা মুক্তিলাভ করবে বা ভগবানলাভ করবে। কর্মপ্রচেষ্টাকে সেবাজ্ঞান করার যে-স্বরূপ শ্রীরামকৃষ্ণ ও শ্রীশ্রীমার জীবনে শ্বাস-প্রশ্বাসের মতো স্বতই ভগবচ্চিন্তায় তাঁদের ব্যাপৃত রেখেছিল, গম্ভীরানন্দজী লক্ষ করেছেন তার মধ্যে চারটি যোগের অন্তর্ভুক্তি যেমন আছে, আবার আছে শ্রীরামকৃষ্ণ-প্রার্থিত সুষম সমন্বয়ে জীবনগঠনের সুযোগ ও সম্ভাবনা। সেই উদ্দেশ্যকে লাভ করার পথে এতদিনের 'নিষ্কামকর্ম', 'কর্মযোগ', শংকরাচার্যের 'জ্ঞান ও কর্মের সমুচ্চয়তার অসম্ভাবনা' ইত্যাদি শাস্ত্রীয় কূটকচালির ভিতর থেকে মূল সারসত্যটি গ্রহণ করে, সংস্কারক বা রাজনীতির লোককল্যাণস্পৃহার আঁচ বাঁচিয়ে, শ্রীরামকৃষ্ণ-শ্রীমার জীবনের মাধুর্য ও স্বাভাবিক ঈশ্বরবুদ্ধিকে সর্বাগ্রে স্থান দিয়ে সমস্ত কর্মসাধনাকে 'সেবাযোগ'-এ অভিহিত করা স্বামী গম্ভীরানন্দজীর এক অত্যন্ত উচ্চমানের মৌলিক অবদান। এ তাঁর সুগঠিত সমন্বিত জীবন এবং বৌদ্ধিক চেতনারই ফল। সেখানে 'শ্রীরামকৃষ্ণ-মূষা' এবং 'সেবাযোগ' একই দ্যোতনা প্রকাশ করছে। ভবিষ্য সমাজ হয়তো একদিন এই সর্বযোগের সুষম সমন্বয়ে গঠিত চরিত্রগঠনের পন্থাকে 'শ্রীরামকৃষ্ণ-যোগ' বলেই নামাঙ্কিত করবে।

পূজ্যপাদ মহারাজের মননে মৌলিকতা যেন এক সহজ সরল ভাবের উৎসারণ। তিনি একবার একটি ধর্মসভায় সভাপতিত্ব করছিলেন। প্রথমে দুজন বক্তা তাঁদের বক্তব্য প্রদান করেন। প্রথম জনের অভিমত ছিল, শ্রীরামকৃষ্ণ সন্ন্যাসীদের জন্য এসেছিলেন। দ্বিতীয় বক্তার বয়ানে শোনা গেল, শ্রীরামকৃষ্ণ গৃহীদের জন্য এসেছিলেন। পূজ্যপাদ মহারাজ তাঁর স্বভাবসিদ্ধ সংক্ষিপ্ত আলোচনায় এক মৌলিক সত্যের আদর্শ উন্মোচন করে বললেন, "শ্রীরামকৃষ্ণ সন্ন্যাসী কিংবা গৃহী কারও জন্যই আসেননি। তিনি এসেছেন তাঁকে যারা আন্তরিক চায়, তাদের জন্য।" এমনই ছিল মহারাজের মৌলিক ভাবনার স্বতঃস্ফূর্ত স্ফুরণ!

শ্রীরামকৃষ্ণ-পার্ষদদের প্রজন্ম এবং পরবর্তী প্রজন্মের সন্ধিতে পূজ্যপাদ মহারাজের জীবন এবং কর্মের অবস্থান খুবই গুরুত্বপূর্ণ, বিশেষত মতাদর্শ বিচার-বিশ্লেষণ ও পরম্পরাপ্রবাহের ক্ষেত্রে। মহারাজ বুঝেছিলেন, ঠাকুরের পার্ষদদের জীবন একইসঙ্গে শাস্ত্রের মর্মার্থ ও সঙ্ঘের আদর্শ প্রকাশে জীবন্ত উৎস। কিন্তু আগামী যুগকে কিছু বিশিষ্ট উচ্চকোটি সাধুর সান্নিধ্য, রামকৃষ্ণ-বিবেকানন্দ সাহিত্য ও সঙ্ঘের ইতিহাস পঠন-পাঠনের মধ্য দিয়ে উপরিউক্ত উভয়বিধ উপযোগকে করায়ত্ত করতে হবে। সেদিক থেকে স্বামী গম্ভীরানন্দকৃত রামকৃষ্ণ-বিবেকানন্দ সাহিত্যের প্রাথমিক বহু গ্রন্থের রচনা এবং প্রয়োজনে ভাবাদর্শের বিশ্লেষণ অপরিহার্য এক আকর হয়ে রয়েছে।

শ্রীসারদা মঠ ও মহারাজ

এ-বিষয়ে বিস্তারিত জানা যায় শ্রীসারদা মঠের বর্তমান সাধারণ সম্পাদিকা পূজনীয়া প্রব্রাজিকা অমলপ্রাণামাতাজীর স্মৃতিকথা থেকে। 'বিবেকানন্দ বিদ্যাভবন' কলেজের প্রশাসনিক কাজকর্ম সম্পর্কিত সমস্যাগুলির সমাধানের জন্য শ্রীসারদা মঠের সম্পাদিকা মুক্তিপ্রাণামাতাজী তাঁকে গম্ভীরানন্দজীর কাছে পরামর্শ নিতে পাঠাতেন। কলেজ ভবন উদ্বোধন, ছাত্রী-আবাস উদ্বোধন, শ্রীসারদা মঠের মন্দিরের ভিত্তি প্রতিষ্ঠা ও মন্দির উদ্বোধন প্রভৃতি বহু উপলক্ষ্যে পূজনীয় মহারাজ বহুবার সারদা মঠ ও তার বিভিন্ন শাখাকেন্দ্রে গিয়েছেন। সন্ন্যাসিনীরা তাঁর অকৃপণ স্নেহ পেয়েছেন। সঙ্ঘের আদর্শ প্রচারে শ্রীসারদা মঠের ভূমিকা প্রসঙ্গে গম্ভীরানন্দজী বলেছিলেন, ''মা পরিচালিত করছেন সঙ্ঘকে, শুধু আমাদের ওখানে (বেলুড় মঠে) নয়, এখানেও (অর্থাৎ সারদা মঠেও)।... যেসব ক্ষেত্রে আমাদের প্রবেশ নিষেধ বা যাওয়া সম্ভবপর নয়, সেসব ক্ষেত্রেও মেয়েরা কাজ করতে পারে। এই কয়েক বছরের ভিতরেই আপনারা দেখেছেন প্রতিষ্ঠান কতটা সাফল্য অর্জন করেছে এবং ভবিষ্যতে এর চেয়েও বেশি সাফল্য অর্জন করবে।... কুশলতা এবং কাজের গণ্ডি হিসাব করলে বলা যায় এদের সামনে একটি প্রকাণ্ড জগৎ রয়েছে।''[২]

'রামকৃষ্ণ সঙ্ঘে স্বামী গম্ভীরানন্দজীর অবদান' শিরোনামে নিবন্ধটি শুরু হয়েছিল। যেহেতু শ্রীরামকৃষ্ণ-ভাবাদর্শ সমগ্র জগতের কল্যাণের নিদান এবং তারই রচনাকার, ইতিহাসবিদ এবং ব্যাখ্যাকার ছিলেন পূজ্যপাদ মহারাজ, লক্ষ করা গেল, তাঁর জীবনের অবদান কেবলমাত্র আর সঙ্ঘের বেষ্টনীর মধ্যে সীমাবদ্ধ থাকল না। তাঁর অবদান হয়ে উঠেছে বিশ্বজনীন। যতদিন রামকৃষ্ণ-বিবেকানন্দ ভাবধারার বিচিত্র ক্ষেত্রে যেমন আধ্যাত্মিক জীবনযাপন, প্রশাসনিক কুশলতা, সঙ্ঘের বিস্তার, ভাবাদর্শের ইতিহাস রচনা ও বিশ্লেষণের প্রেক্ষায় অনুসন্ধিৎসু মানুষ উপাদান সন্ধান করবে, ততদিন সেই পরিপ্রেক্ষিতে ভাবান্দোলনের প্রথম শতকের অন্যতম বিশিষ্ট পুরোধা ব্যক্তিত্বরূপে স্বামী গম্ভীরানন্দজী চিরভাস্বর হয়ে থাকবেন এবং ভবিষ্য জগতকে পথপ্রদর্শন করে চলবেন সেকথা বলা বাহুল্যমাত্র। ✠

সহায়ক গ্রন্থ

১। সংকলন : সুজাতা সিংহ, *স্বামী গম্ভীরানন্দ এক মহাজীবনের কথা*, স্বামী গম্ভীরানন্দ সেন্টিনারি কমিটি, ২০০৮

তথ্যসূত্র

১। দ্রঃ স্বামী সারদানন্দ, *শ্রীশ্রীরামকৃষ্ণলীলাপ্রসঙ্গ*, উদ্বোধন কার্যালয় : কলকাতা, ২০০০), ভাগ ১, সাধকভাব, পৃঃ ২১৬

২। সম্পাদনা : স্বামী পূর্ণাত্মানন্দ, *নবযুগধর্ম*, উদ্বোধন কার্যালয়, ২০০৮, 'শ্রীশ্রীমা ও স্ত্রীমঠ', পৃঃ ১২২